Script for Vigyan Prasar Radio Serial

Segment No.5

Episode No. 38 : Indias leading examples in risk reduction techniques to mitigate the impact of floods, drought etc. on yield

Written by Dr. Sima Mukhopadhyay

From Science Communicators Fourm

দৃশ্য - ১

(ট্রেন স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছে। হকারদের জিনিসপত্র কেনা বেচার শব্দ)

কমলেশ : আমাদের আর দুটো সিট্ কোথায় গেল? এ-এইতো 45 আর 46। দাদু এই সিট্ দুটো তো আমাদের।

বৃদ্ধ : জানি বাবা। আমাদের একটা সিট্ নীচে আর একটা পড়েছে উপরে। আমাদের তো বয়েস হয়েছে একটা সিট্ যদি একটু বদল করে নেওয়া যায়।

কমলেশ : আসলে দাদু এই সিট্ দুটোয় দু'জন ম্যাডাম যাবেন। তবে ওঁনারা দুর্গাপুরে নেমে যাবেন ঘন্টা তিনেকের মধ্যে। তারপরে ওই সিটে যাদের বুকিং আছে তাদের সঙ্গে কথা বলে নেবেন। মনে হয়না খুব অসুবিধা হবে। এখন আপাতত আরাম করে বসুন দুজনে।

সবিতা : আমাদের সিট্ নাম্বার হল 45 আর 46। চলে এসো সুনন্দা এদিকটায়।

কমলেশ : ও-ও ম্যাডামরা এসে গিয়েছেন। নমস্কার ম্যাডাম। আমিই কমলেশ। ফোনে যোগাযোগ আমিই করেছিলাম আপনাদের সঙ্গে। আপনাদের বাড়ি থেকে আসতে কোন অসুবিধা হয়নি তো ম্যাডাম?

সবিতা : না-না একেবারেই না। আর আজ রাস্তাও বেশ ফাঁকা ছিল অন্যদিনের তুলনায়। মোবাইলে যোগাযোগ করে একসাথেই চলে এসেছি আমরা।

কমলেশ : ও: তাই বুঝি। আমাদের অফিসের অন্যরা পাশের বগিতেই আছে। আমি মাঝে মাঝে এসে আপনাদের খবর নিয়ে যাবো ম্যাডাম।

সবিতা : বয়সে অনেক ছোট তুমিই বলছি কমলেশ। তুমি ভাই তখন থেকে ম্যাডাম ম্যাডাম করছো কেন? আমি সবিতাদি আর উনি সুনন্দাদি, ঠিক আছে?

কমলেশ : ঠিক আছে দিদি। এক সাথে টিকিট কাটলে এক কামরাতেই যাওয়া যেত। আমাদের টিকিট অনেক আগে থেকে কাটা হয়েছে আর রিসোর্স পার্সনদের টিকিট পরে কাটা হয়েছে। তাই আলাদা বগি হয়ে গিয়েছে।

সুনন্দা : ও তুমি কিছু ভেব না। আমরা দুজনে গল্প করতে করতে চলে যাবো, ঘন্টা তিনেকের তো ব্যাপার।

সবিতা : তোমাকে আর মাঝে মাঝে এসে খবর নিতে হবে না। একেবারেই নেমে যাবো। আর কিছু দরকার হলে মোবাইলতো খোলাই থাকছে।

কমলেশ : ঠিক আছে দিদি। ট্রেন বোধ হয় এখুনি ছাড়বে। সিগনাল দিয়ে দিয়েছে। কিছু দরকার হলে জানাবেন। বর্ধমানে ট্রেন অনেক্ষণ দাঁড়ায় আমি না হয় তখন এসে দেখা করে যায়।

সুনন্দা : তুমি কোন চিন্তাই কোর না। আমার তো বাইরে ঘোরাফেরা করার অভ্যাস আছে। উনিও মনে হয় ট্যুর করতে অভ্যস্ত।

সবিতা : হ্যাঁ, হ্যাঁ আমাকে অফিসের কাজে প্রায়ই ট্যুরে যেতে হয়। আচ্ছা আমরা দুর্গাপুরে নেমে by car পানাগড় হয়ে জঙ্গল মহল যাবো। তাই তো?

কমলেশ : হ্যাঁ স্টেশন থেকে ঘন্টা দেড়েকের পথ। চলি দিদিরা ট্রেন ছাড়ছে।

(ট্রেন ছাড়ার আওয়াজ। কাগজ-কাগজ-তাজা খবর-তাজা খবর-কাগজ-কাগজ)

সুনন্দা : তুমি অত চিন্তা কোর না। এই কাগজ ..... দেখি দেখি এই কাগজটা দাও।

সবিতা : আজকাল কি যে হয়েছে খবরের কাগজের প্রথম পাতাটা জুড়ে বিজ্ঞাপন। মেন হেডিং খুঁজতে তোমাকে পাতা উল্টে যেতে হবে।

সুনন্দা : একদম ঠিক। সত্যিই ভীষণ বিরক্ত লাগে। আজ দেখছি জল নিয়ে দ্বিতীয় পাতায় খুব বড় করে দিয়েছে।

সবিতা : তাই নাকি? দেখি দেখি হেডিংটা দেখি। জল সঙ্কট ক্রমে তীব্র মহানগর নির্বিকার। আচ্ছা আপনার সরি সুনন্দা তোমার হলে কাগজটা একটু দিও, চোখ বুলিয়ে নেব। আমি যে ক্লাসটা ওখানে নেব তার সঙ্গে শহরের জল সঙ্কটের ব্যাপারটা relate করিয়ে দেব।

সুনন্দা : ওরা তো programme schedule পাঠিয়েছে। তাতে দেখছিলাম তোমার class টা হল Impact of flood and drought on yield.

সবিতা : হ্যাঁ দেখ মাটির তলার জল মানে ভূগর্ভস্থ জলের প্রধান উৎসই হল বৃষ্টি। কিন্তু গত এক দশকে কমেছে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ। এদিকে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঘাস-ঘাছপালা-মাটির বদলে কংক্রিটের ঢালাইয়ের চাদর। তাই ভুগর্ভস্থ জলস্তর বাড়ার সুযোগ দিন দিন কমে যাচ্ছে।

সুনন্দা : হ্যাঁ তুমি ঠিকই বলেছ। আর বর্ষায় যতটুকু জল মাটির নীচে ঢোকার সুযোগ পায় তার তুলনায় অনেক অনেক বেশি পরিমাণ জল তুলে নেওয়া হচ্ছে deep tubewell এর মাধ্যমে। তাই ক্রমশ: কমে আসছে হাজার হাজার বছর ধরে জমা জলের ভাণ্ডার।

বৃদ্ধ : কিছু মনে কোর না মা। তোমরা এত interesting বিষয় নিয়ে কথা বলছো। আমি তোমাদের কথার মধ্যে যোগ না দিয়ে পারছি না। আমি Irrigation Department এ বহুদিন ছিলাম। এইসব নিয়েই সারা জীবন কাটিয়েছি।

সবিতা : বলুন মেসোমশাই আপনি কী বলবেন বলছিলেন।

বৃদ্ধ : তোমরা হয়তো জানো কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় ভূ-জল পর্ষদ জানিয়েছে রাজ্যের ১৩টি জেলায় মাটির নীচের জলস্তর যে হারে নামছে তা গভীর উদ্বেগের কারণ।

সবিতা : হ্যাঁ জানি। কালো তালিকায় নাম উঠেছে 68 টি ব্লকের।

বৃদ্ধ : অনেক সহ্য করে প্রকৃতি এখন জানান দিচ্ছে। শুকিয়ে যাচ্ছে নদী। পলিস্তরে সঞ্চিত থাকা ফ্লোরাইড ও আর্সেনিক সক্রিয় হয়ে বিষাক্ত করে দিচ্ছে মাটির নীচের জল। আর সেই জল পান করতে বাধ্য হচ্ছে প্রায় দুই কোটি মানুষ।

সুনন্দা : কী ভয়াবহ অবস্থা।

বৃদ্ধ : কেন এমন হল বল দেখি? দেখ আগে কৃষকেরা ফসল নির্বাচন করতো জলের প্রাপ্যতা অনুসারে। শুখা মরসুমে আর কম বৃষ্টির এলাকায় এমন ফসলের চাষ করত যাতে কম জল লাগে। কিন্তু সবুজ বিপ্লবের সময় থেকে শুরু হল অন্য খেলা। দেশজ বীজের বদলে এল নতুন বীজ। যার জলের চাহিদা অনেক বেশি।

সবিতা : আপনি মূলত বোরো ধানের কথা বলছেন তো?

বৃদ্ধ : হ্যাঁ, এই বোরো যখন চাষ হয় সে সময় দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি হয় কম। ফলে প্রায় পুরো জলটাই টেনে তুলতে হয় মাটির তলা থেকে।

সবিতা : এখন অনেক এলাকাতেই শুখার সময় অগভীর নলকূপ কাজই করে না। প্রকৃতি এখন দেউলিয়া।

বৃদ্ধ : ভেবে দেখ আগেকার দিনে কৃষি জমিতে নতুন পলি ফেলে বন্যার জল নেমে গেলে কৃষকেরা চাষ শুরু করতেন।

সুনন্দা : কোন রাসায়নিক সারের ব্যাপারই ছিল না। ওসব ছাড়াই প্রচুর ফলন হত।

বৃদ্ধ : বৃটিশেরা আসার পর এদেশের নদী-জল-পলির সম্পর্কটাই ধীরে ধীরে নষ্ট হয়ে গেল।

সবিতা : আপনি একদম ঠিক বলেছেন মেসোমশাই।

বৃদ্ধ : এইতো অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হয়েছিল নদীর পাড় বরাবর বাঁধ দিয়ে বন্যা নিয়ন্ত্রের চেষ্টা। আর উনবিংশ শতাব্দী থেকে শুরু হল নদীতে আড়াআড়ি বাঁধ দিয়ে সেচ ব্যবস্থার প্রসার। আর স্বাধীনতার পর শুরু হল বড় বাঁধ নির্মাণের নতুন যুগ।

সবিতা : এই সব বড় বাঁধ তৈরি করতে গিয়ে সবার অলক্ষে হারিয়ে গিয়েছে বহু মানুষের বাস্তুভিটে। তলিয়ে গিয়েছে বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল। হারিয়ে গেছে বিপুল জীব বৈচিত্র। বিশাল জলাধার তৈরির জন্য যাঁরা উদ্বাস্তু হয়েছেন তাঁর প্রায় সবাই জনজাতি বলা যায়।

বৃদ্ধ : নদীতে বড় বাঁধ দিয়ে কতটা লাভ হয়েছে বলতে পার?

নন্দিতা : সেটাই তো আসল কথা।

বৃদ্ধ : ব্যাপারটা ভালো করে বুঝতে হবে। একই জলাধারের জল ব্যবহার করে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সেচের কাজ করা যায় না।

সবিতা : ঠিকই তো বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য জলাধার থেকে ক্রমাগত জল ছাড়তে হবে। ফলে সেচের জন্য বৃষ্টির জল শুখা মরশুম পর্যন্ত জমিয়ে রাখা যায় না।

বৃদ্ধ : তা হলে এত কান্ড করে লাভটা কোথায় হল বোঝাও?

(বৃদ্ধের প্রচন্ড কাশি শুরু হল)

বৃদ্ধের স্ত্রী : হ্যাঁ গো তোমাকে না ডাক্তার কথা কম করতে বলেছে। তুমি তো কোন কথাই শুনতে চাওনা। কাশির দমক বাড়লে কষ্টটা তো তোমাকেই পেতে হবে।

বৃদ্ধ : কাশতে কাশতে - থাম দিকি। বোবা হয়ে বসে থাকতে হবে।

বৃদ্ধের স্ত্রী : শোন মেয়েরা ওর কথা শুননা। তোমরা নিজের মনে গল্প কর। আসলে ওনার একটা গলার সমস্যা আছে। তাই ডাক্তার কম কথা বলতে বলেছে।

সবিতা : ঠিক আছে মাসিমা চিন্তা করবেন না। মেসোমশাই আপনি একটু চোখ বন্ধ করে বিশ্রাম নিন। কাশির দমক ধীরে ধীরে কমে যাবে।

(ঝাল মুড়ি-ঝাল মুড়ি-চায়-কফি-চায় কফি)

সবিতা : অনেক গুরু গম্ভীর আলোচনা হয়েছে এবার একটু ঝাল মুড়ি খাওয়া যাক্। কী বল?

সুনন্দা : আ: এক্কেবারে মনের কথাটা বলেছ। ট্রেনে উঠে ঝাল মুড়ি না খেলে কেমন যেন ফাঁকা ফাঁকা লাগে। অ্যাই ঝালমুড়ি .... এদিকে ... এদিকে। বেশ ভালো করে বানাও। তবে সেদ্ধ আলু দিও না। মাসিমা আপনারা খাবেন তো?

মাসিমা : না গো মেয়েরা। আমাদের কি আর বাইরের জিনিস খাওয়ার বয়েস আছে। তোমরা খাও।

ঝালমুড়িওলা: দিদি ঝাল কম না বেশি?

সবিতা : ঝাল কম করে দাও আমারটায়।

সুনন্দা : আমারটায় ঝাল দাও। ঝালমুড়ি খেতে খেতে ..... আচ্ছা সবিতাদি আমরা যে training programme এ যাচ্ছি তুমি কি ওদের সঙ্গে আগেও programme করেছ?

সবিতা : হ্যাঁ, এর আগে ওদের বেশ কয়েকটা training এ আমি থেকেছি। একটা হয়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগণার নিমপীঠে। সেটা ছিল Resource Person trianing. সেখানে জেলার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের আধিকারিকরা এসেছিলেন। Literacy Programme এর সঙ্গে Development programme এর linkage তৈরি ছিল ওই training এর মূল উদ্দেশ্য। আসলে target group তো দুটো programme এরই এক। দেশের অবহেলিত পিছিয়ে পড়া মানুষ জন। তাই jointly programme নিলে ব্যাপারটা জোরদার হয়।

সুনন্দা : বা: বেশ interesting তো।

সবিতা : হ্যাঁ আর একটা programme এ গিয়েছিলাম। যেটা হয়েছিল North Bengal University তে। সেটা ছিল মূলত income generating programme এর উপর।

সুনন্দা : আর এখানে কাদের Training দেওয়া হবে?

সবিতা : এখানে ডাকা হচ্ছে self help group এর দল নেত্রীদের। এরা তার দলের নিরক্ষর মহিলাদের কী ভাবে কম সময়ের মধ্যে সাক্ষর কার যায় তার Training নেবে।

সুনন্দা : কিন্তু আমাদের ভূমিকাটা এখানে কী?

সবিতা : আসলে এখানে বয়স্ক নিরক্ষর মানুষদের শেখাবার জন্য বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। এদের বইপত্র দেখলে বুঝতে পারবে এদের পড়ানোর পদ্ধতি খুব বিজ্ঞান সম্মত। বয়স্ক মানুষদের জীবন জীবিকা পরিবেশ সংস্কৃতির সঙ্গে সাযুর্য রেখে রয়েছে প্রাইমার। এই বইয়ের সাহায্যে খুব কম সময়ে মধ্যে এরা পড়তে লিখতে পাবে। আবার একই সঙ্গে কম খরচে পুষ্টি, আয় বাড়ানোর নতুন দিশা, আইনের অধিকার, বিয়ের বয়স, পরিবেশ, কুসংস্কার দূরীকরণ ইত্যাদি বিষয়গুলি সম্পর্কেও ধারণা হয়।

সুনন্দা : তোমার কাছে যে প্রাইমারের কথা বললে আছে এখানে?

সবিতা : হ্যাঁ, দাঁড়াও মনে হচ্ছে আমার ব্যাগে একটা primer আছে। ও: না প্রাইমার নয় এটা হল আলোচনার নির্দেশিকা। প্রাইমার তুমি ওখানে ট্রেনিং সেন্টার পেয়ে যাবে। এই বইটাও দেখতে পার।

সুনন্দা : দেখি কেমন বইটা।

সবিতা : এখানে যারা বয়স্কদের পড়াবে তাদের কী ভাবে বিভিন্ন বিষয়ে বয়স্কদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে দেওয়া রয়েছে। দেখ পরিবেশ দূষণ, আইনি অধিকার, লিঙ্গ বৈষম্য, টেঁকসই উন্নয়ন, জৈব চাষ, বিয়ের বয়স, বিপর্যয় মোকালিা, ভোটের অধিকার ইত্যাদি কত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বিভিন্ন বিষয় বিশেষজ্ঞদের এরা ট্রেনিং-এ ডাকে শিক্ষার্থীদের ব্যাপারটা ভালো করে সবিস্তারে ব্যাখ্যা করার জন্য।

সুনন্দা : বাব্বা এত্ত সব ব্যাপার আমার জানাই ছিল না।

সবিতা : আমারতো এই প্রতিষ্ঠানের টেনিং-এ আসতে খুব ভালো লাগে। কারণ শুধু এক তরফা শিক্ষার্থীর সঙ্গে কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করেই শেষ হয়না, এদের কাছ থেকে প্রত্যন্ত এলাকার মানুষ জনদের সম্পর্কেও অনেক তথ্য আমি সংগ্রহ করি আমার গবেষণার কাজের।

সুনন্দা : বা: খুব ভালো তো! রথ দেখা কলা বেচা দুটোই একসঙ্গে হয়ে যায়।

সবিতা : হ্যাঁ, তা এক রকম বলতে পার। আচ্ছা তুমি বইটা দেখতে থাকে, আমি ততক্ষণে খবরের কাগজটা একটু উল্টেপাল্টে দেখি।

(ট্রেন চলার আওয়াজ)

দৃশ্য - ২

(ট্রেনিং সেন্টার। খুব নীচু গলায় কথাবার্তায় আওয়াজ)

সবিতা : এতক্ষণ তোমাদের সঙ্গে যে বিষগুলো নিয়ে আলোচনা করলাম তা হল – অনেকদিন হল নতুন ধরনের চাষ শুরু হয়েছে। উচ্চ ফলনশীল বীজ দিয়ে, জলের জন্য মাটির তলার পাম্প ব্যবহার করে, দামী রাসায়নিক সার দিয়ে জমিতে ভালোই ফলন হচ্ছিল। কিন্তু সমস্যাটা হল .....

শিক্ষার্থী-১ : দিদি আমি বলবো।

সবিতা : হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলো।

শিক্ষার্থী-১ : চাষের জন্য মাটির তলা থেকে অনেক জল টেনে নেওয়াতে মাটির জল আরো নীচে নেমে যাচ্ছে।

শিক্ষার্থী-২ : পোকামারার ওষুধ দেওয়াতে মাঠের বন্ধু পোকারা মারা যাচ্ছে। প্রজাপতি, মৌমাছি পালিয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষার্থী-৩ : ধানক্ষেতের চুনোমাছেদের আর দেখাই মেলে না।

সবিতা : তাহলে দেখ চাষের খরচ দিন দিন বাড়ছে। এদিকে রাসায়নিক বিষে জমি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। টিউবলের জলে অনেক জায়গায় বিষাক্ত আর্সেনিক কি ফ্লোরাইড উঠে আসছে। অথচ দেখ মাটির ওপরে জলের অভাব নেই। কমবেশি যেখানে যেটুকু বৃষ্টি হয় তাকে যদি ঠিক মত করে রাখা যায় অনেক লাভ। আমাদের দেশে পুরনো দিনের লোকেরা বৃষ্টি জল ধরে রাখার নানান কায়দা কানুন জানতেন। এখনো কোথাও কোথাও সে সব দেখতে পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থী-১ : দিদি পুরুলিয়ার মান বাজারে আমার মামা বাড়ি। সেখানে দেখেছি পরপর আট্‌টা পুকুর উপর থেকে নীচ পর্যন্ত। সবচেয়ে উঁচুতে আছে একটা বড় দীঘি। সেখান থেকে একের পর এক পুকুর গেঁথে ঠিক যেন একটা পুকুরের মালা।

সবিতা : হ্যাঁ, ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত এভাবে পুকুরের মালা করাকে বলে দশপলা পদ্ধতি। তামিলনাড়ু ও উড়িষ্যায় খুব পুরোন কাল থেকে এরকম পুকুর কাটা হত। তাতে সাধারণত দশটা পুকুর থাকতো। কখনও আটটা বা এগারোটা, জায়গার সুবিধা বুঝে। ব্যাপারটা হল উঁচু পুকুর থেকে জল নীচের পুকুরে আসে। সেখান থেকে পরেরটায় যায়। এইভাবে এই পুকুরের মালা চমৎকার কাজ করে। পুকুরের পাশে পাশে ধাপে ধাপে ছড়িয়ে পড়া ক্ষেতের চাষে সেচ হয়। আশপাশের কুঁয়োতে সহজেই জল পাওয়া যায়। আবার গয়ার ফল্গু নদীর ধারে আছে 'আহর পইন'।

শিক্ষার্থী-২ : সেটা আবার কেমন?

সবিতা : ফল্গু নদীকে এমনি দেখলে বোঝাই যাবে না। জলের চিহ্ন নেই। খালি ঝরঝরে বালি। কিন্তু একহাত বালি খুঁড়লেই সুন্দর টলটলে জল। ওই জলে ওখানকার লোকেরা নাওয়া খাওয়া সব সারে।

শিক্ষার্থী-১ : দিদি ওই জল টেনে তুলে চাষবাস করা তো মুশকিল।

সবিতা : তাই বর্ষাকালে ফল্গু নদীতে যখন জলের ঢল নামে, নদীর কাছাকাছি গাঁয়ের মানুষেরা নদী থেকে জমির ভিতর খাল কেটে রাখে। এই খালকে বলে 'পইন'। খালগুলো কাটা হয় মাছের কাঁটার মতো তেরছা করে। পইন এর শেষে মাটিতে খুব বড় অথচ অগভীর গর্ত কাটা থাকে। সেটা পুকুরের মতো গভীর নয়। বরং গামলার মতো ছড়ানো। তাকে বলে 'আহর'।

শিক্ষার্থী-২ : ও তাই নাম হয়েছে 'আহর পইন'।

সবিতা : আহর ভরে গেলে আশপাশের অন্যান্য ক্ষেতে জল ছড়িয়ে পড়ে ছোট বড় নালা দিয়ে। এই নালাগুলোকে ওখানকার লোকেরা বলে 'ভোগলা'। অনেকগুলো পইন ও আহরের ভোগ্‌লা থেকে ওই এলাকার জমি দিব্যি ভিজে ওঠে। তখন চাষের কাজ শুরু হয়। এই 'আহর পইন'-এর সেচ বিহারে খুব পুরোন। এক সময়ে প্রতিটি গ্রামে চাষীদের নিজেদের 'পইন' থাকতো।

শিক্ষার্থী-৩ : বা: দারুণ ব্যাপার তো!

সবিতা : গত কুড়ি পঁচিশ বছর ধরে ওখানে পাম্পে জল তুলে, সার দিয়ে চাষ হচ্ছে। এদিকে 'পইন' গুলো অবহেলায় নষ্ট হয়েছে। এখন আবার চাষিরা সেগুলোকে সারিয়ে আহর পইন-এর কাজ শুরু করেছে।

শিক্ষার্থী-১ : আগেকার কালের মানুষ অনেককিছু জানতো।

সুনন্দা : সবিতাদি আমি বেশ কিছুদিন আগে খবরের কাগজেই পড়েছি রাজস্থানের উষর অঞ্চলে গড়ে ওঠা দেশজ জল সংরক্ষণ পদ্ধতি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পেয়েছে।

সবিতা : তুমি ঠিকই বলেছ। আমি এখনই রাজস্থানের জোহড় বাঁধের কথা বলবো ভাবছিলাম। রাজস্থানের আলোয়াড় জেলা আরাবল্লী পাহাড়ের কাছাকাছি। জমি তাই উঁচু নীচু, ঢালু। কিছুটা আমাদের পুরুলিয়ার ঝালদা-কাশীপুর কি তার আশপাশের মত। তবে আলোয়ারে বৃষ্টি হয় পুরুলিয়ার পাঁচ ভাগের এক ভাগ।

শিক্ষার্থী-২ : তাহলে তো ওখানকার মাটি একেবারে রুক্ষ।

সবিতা : হ্যাঁ। ওখানে বৃষ্টি কম। বালি মাটিতে জল দাঁড়ায় না। ওখানকার বেশির ভাগ লোকের পেশা পশু চরানো। ছেলেরা পশু নিয়ে দূর দূর জায়গায় চলে যায়। আর মেয়েরা ঘর সামাল দেয়। আর মাথায় ওপর চার-পাঁচটা কলসি বসিয়ে মাইলের পর মাইল হেঁটে যায় জল আনতে।

শিক্ষার্থী-৩ : আমি টিভিতে দেখেছি রাজস্থানী মেয়েরা মাথায় হাঁড়ির ওপর হাঁড়ি বসিয়ে দিব্বি হেঁটে যাচ্ছে।

শিক্ষার্থী-২ : কেন মাথার উপর বড় থেকে ছোট সাত আটটা ঘট বসিয়ে কেমন বন বন করে ঘুরে ঘুরে নাচ দেখায়, দেখিস নি বুঝি?

সবিতা : হ্যাঁ, দৈনন্দিন কাজের থেকেই ওই রকম নৃত্যভাবনা এসেছে। ভেবে দেখ একটু জলের জন্য মেয়েদের কী ভাবে মাইলের পর মাইল হাঁটতে হয়। সেই সব দূরের কুঁয়োতে জলও মেলে আশি-পঁচাশি হাত নীচে। তবে পুরনো কালে এদের এত কষ্ট ছিল না। যত কম বর্ষাই হোক তখনকার মানুষ সেই জলকেই কাজে লাগাতে জানতো। কালে কালে সে সব পুরনো বিদ্যে হারিয়ে গিয়েছে। বুড়ো মানুষেরাও বহুদিন না করে করে সে বিদ্যে ভুলে গিয়েছে। শেষে কোলিয়ালা গাঁয়ের মঙ্গু প্যাটেল মনে করে বলতে পারলেন জেহড় বাঁধের কথা।

শিক্ষার্থী-১ : কেমন সেই বাঁধ দিদি?

সবিতা : সেটা বলবার জন্যইতো তোমাদের এতগুলো কথা বললাম। মঙ্গু প্যাটেলের কথা মতো কাজ শুরু হল। টিলা কি ছোট পাহাড়ের গায়ে, এমনকি ঢালু মাঠেও জল গড়িয়ে যাবার পথের ওপর সেখানকার পাথর আর কাদা দিয়ে ছোট ছোট পাঁচিল গাঁথা হতে লাগলো।

শিক্ষার্থী-৩ : দিদি পাঁচিল গুলো কতটা উঁচু?

সবিতা : তা প্রায় আড়াই তিন হাত উঁচু আর হাত দুয়েক মোটা। আর লম্বা হল যার যেমন সাধ্য মতো। কোনটা দশ হাত তো কোনটা পঁচিশ হাত। মেয়েরাই বেশি এই পাঁচিল গাঁথলো। এগুলোকে ওরা বলে 'জোহাড়'।

শিক্ষার্থী-২ : ও এই ব্যাপারটাই তাহলে জোহড় বাঁধ।

সবিতা : হ্যাঁ। এই জোহড়গুলো গাঁথা হয় একটু গোলচে করে অনেকটা ধনুকের মত বাঁকিয়ে। গাঁয়ের লোকেরা দেখেছিলেন পাহাড় থেকে গড়িয়ে নামা জলের জোর ধাক্কায় গাঁথনি ভেঙ্গে যেতে পারে। তাই একটু বাঁকিয়ে ধনুকের মতো করা হতো।

নন্দিতা : বা: ব্যাপারটা খুব কঠিন জটিল নয় কিন্তু দারুণ কাজের।

সবিতা : হ্যাঁ বর্ষাকালে পাহাড়ের গা বেয়ে জল নেমে যাবার কালে জলের সাথে বয়ে যেতে থাকা মাটি ওই জোহড়গুলোর পিছনে আটকে পড়তে থাকে। তার সাথে আটকে পড়ে একটু একটু জল। ধীরে ধীরে ওই নরম জমা মাটিতে ঘাস গজাতে শুরু করে। কালে

শিকড় চুঁয়ে চুঁয়ে জল মাটির ভিতর ঢুকতে শুরু করে। বছর পাঁচেকের মধ্যে মাঠ, টিলা ডুংরি পাহাড়ে ন্যাড়ামোড়া চেহারা গিয়েছে পাল্টে। নরম মাটি, গাছপালা, ঘাসে ঢেকে গেছে এলাকাটা।

শিক্ষার্থী-৩ : বা: দারুণ ম্যাজিক।

সবিতা : তারপর মাটির চোঁয়ানো জলে শুকনো ছোট ছোট নদীগুলোতে জল এলো। পশুর খাবার ছাড়াও হতে লাগলো নানান সবজি। যার গাঁ ছেড়ে চলে গিয়েছিলো তারা আবার ফিরে এলো। বেশ কয়েকবছর সে দেশে তেমন বৃষ্টি হয়নি। কিন্তু ওই গাঁয়ের মানুষেরা না খেয়ে মরেন নি।

নন্দিতা : ওই দেশেরই একজন নামটা ঠিক মনে পড়ছে না আশপাশের গাঁয়ের মানুষদের সংগঠিত করে ওই জোহড় বাঁধের সাহায্যে রুক্ষ মাটির বুকে সবুজের আচ্ছাদনে ঢেকে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছেন। তার জন্য তাকে 'রাজস্থানে জল পুরুষ' বলা হয়।

সবিতা : হ্যাঁ, বৃদ্ধ মঙ্গু প্যাটেলের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে রাজস্থানের রাজেন্দ্র সিং আলোয়াড়ের সাধারণ মানুষকে নিয়ে অসামান্য জল সংরক্ষণের কাজ শুরু করেন ১৯৮৫ সালে। ২০০১ সালে তাঁকে রমেন ম্যাগসেসে পুরস্কারে ভূষিত করা হয় কমিউনিটি লিডারশিপের জন্য। আর ২০১৫ সালে ২০ মার্চে সম্মানিত করা হয় স্টকহোম ওয়াটার প্রাইজে, যাকে বলা হয় নোবেল প্রাইজ ফর ওয়াটার।

নন্দিতা : হ্যাঁ, সেই সময়ই এই সব তথ্য খবরের কাগজে বেরিয়েছিল।

সবিতা : মূলত অনুপম মিশ্রজী হিন্দিতে লেখেন 'রাজস্থানকে রজত বুন্দে'। গান্ধী শান্তি প্রতিষ্ঠানে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল। এই বইটিই ছিল রাজেন্দ্র সিং এর চিন্তার দার্শনিক ভিত্তি।

নন্দিতা : কাগজের ওই খবরেই পড়েছিলাম বিশ্ব খাদ্য সংস্থা এদেশের পনেরো জন আর বিদেশের পনেরো জন অতিথিকে ডেকে দেখিয়েছিলেন রাজস্থানের জোহড় বাঁধের কাজ।

সবিতা : রাজেন্দ্র সিং একটি এন জি ও তৈরি করেন তরুণ ভারত সংঘ নামে। তাদের সাহায্যে ১৯৮৫ থেকে ২০০৭ সালের মধ্যে ৮,৬০০ জেহড় বাঁধ তৈরি করেন এক হাজারেরও বেশি গ্রামে। রাষ্ট্রসংঘ ২০০৫ সালে যে 'ওয়াটার-এ শেয়ার্ড রেসপনসিটিলিটি' নামে প্রতিবেদনটি তৈরি করে সেখানে এই ধরনের জল সংরক্ষণের জ্ঞানের উল্লেখ আছে।

নন্দিতা : সবিতাদি তোমার ঝুলিতে দেখছি জল সংরক্ষণ নিয়ে নানান অমূল্য তথ্য রয়েছে। তোমার এসব একেবারে ঠোটস্থ।

সবিতা : এইসব নিয়েই তো আছি। আমি এর উপরে একটু গবেষণামূলক কাজ করছি। এই participants দের কাছ থেকেও জল সেচের অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। ..... ও কমলেশ এসে গেছ। আমাদের আলোচনা শেষে পর্যায়ে।

কমলেশ : ঠিক আছে দিদি এবার আধ ঘন্টার চা-পানের বিরতি। তারপর বাকি আলোচনা চলবে। কাল এখানে সকালে নন্দিতাদি ক্লাস নেবেন কম খরচে কী করে পুষ্টিকর খাবার তৈরি করা যায় সেই ব্যাপারে।

সবিতা : এতক্ষণ অনেক আলোচনা হয়েছে এবারে একটা সাঁওতালী গান দিয়ে ক্লাসটা শেষ করলে ভালো হয়।

শিক্ষার্থী-১ : আয় তোরা ওই বৃষ্টির গানটা ধর। দিদি আজ সন্ধ্যায় ছেলেরা ধামসা মাদল নিয়ে সেন্টারে আসবে। সাঁওতালী নাচ হবে। আপনাদেরকেও আমাদের সাথে নাচতে হবে।

নন্দিতা : বা: দারুণ ব্যাপার তা হলে।

কমলেশ : দিদিরা বলছেন মেয়েরা গান শুরু কর।

(সাঁওতালী গানের সুর)।